Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 357 – 362
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

ধনেশ্বর রায় এবং তাঁর নির্বাচিত দুটি গানের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ

জগন্নাথ বর্মন
সহকারী অধ্যাপক
পারফর্মিং আর্টস বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাছার, আসাম
ইমেইল : jagannathbarman2010@gmail.com

Keyword
Dhaneswar Roy, Born, Education and Music practice, Family life, Awards - achievements, Discussion on his two Song.

Abstract
Dhaneswar Roy was born on 28th October 1934 in Alipurduar distric of West Bengal and death on 22nd May 2021. He is an eminent exponent of popular folk song Bhawaiya of Rajbanshi Community's of North Bengal. He has written more than 1000 of song in different categories in Rajbanshi and Bengali languages. Some of the song is become most popular in entire West Bengal, Lower Assam, and Rangpur region in Bangladesh. He has received various awards including Banga Ratno in 2015, Abbasuddin Award in 1997, Thakur Panchanan Barma Award in 2005, Lalon Award etc. His song "O baidesha bandhu re" is a most popular song in North Bengal. And also "Oki o omor garial firia re aiso a heart touching song in Bhawaiya song. I have tried to discuss his life history and meaning and literary values of his two selected songs.

Discussion
একটি জাতির আত্মপরিচয় বহন করে সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য, পেশা, বিনোদন, ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন প্রণালী এবং চিত্ত-বিনোদন-সঙ্গীত প্রভৃতির উপর। উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া। রাজবংশী সম্প্রদায় ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, আসামের গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাও, ধুবরী, কোকরাঝার, বিহারের পূর্ণিয়া, বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর জেলা এই বৃহৎ অঞ্চলের মানুষের প্রধান লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত জগতে এক অনন্য নাম ধনেশ্বর রায়। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের প্রসার, প্রচার ও উন্নতি সাধনে যারা নিরলস সাধনা করে ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে ধনেশ্বর রায় অন্যতম। ষাটের দশকে (১৯৬৪) হরিশচন্দ্র পালের পরিচালনায় ২টি চটকা গানের গ্রামোফোন রেকর্ডের (এইচ.এম.ভি) মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পী

জীবনের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১] তাঁর আগে ১৯৬২ সালে ধনেশ্বর রায় আকাশবাণীর কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এরপর শিল্পীর জীবনে নেমে আসে এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। বাগ্ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন কোনো এক দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে। এই কারণে তিনি দীর্ঘদিন সঙ্গীত চর্চা করতে পারেনিনি। ১৯৮৭ সালে তিনি আকাশবাণীর শিলিগুড়ি কেন্দ্রের দোতারা বাদক হিসেবে স্বীকৃতি পান এবং পুনরায় নিয়মিত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আকাশবাণী কতৃপক্ষ তাঁকে স্বীকৃতি প্রদান করেন ১৯৯৮ সালে।[২] শৈশবকাল থেকে আমৃত্যু তিনি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সত্বেও কোনো প্রতিবন্ধকতাই তাঁর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁর শিল্প চর্চায়। পারিবারিক নানা কারনে প্রথাগত স্কুল শিক্ষায় বেশীদূর অগ্রসর হতে না পারলেও তিনি তাঁর নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর রচনায়। রচনা করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রায় আনুমানিক ১০০০ এরও বেশি গান। যার মধ্যে বেশ কিছু গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তাঁর রচিত অধিকাংশ গান এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। ভাওয়াইয়ার সম্রাট আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, সুরেন রায় বসুনিয়া, নায়ের আলী (টেপু), প্যারীমহন দাস যারা ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে একটি স্বর্নাদ্ধ্যায় রচনা করে গেছেন সেই অধ্যায়কে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ্য প্রতিনিধিত্ব করেছেন ধনেশ্বর রায়। ভাওয়াইয়া ও চটকার নির্দিষ্ট ধারা থেকে বেরিয়ে একটি নতুন আঙ্গিকে ভাওয়াইয়াকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। রাজবংশী ভাষার পাশাপাশি ভাওয়াইয়া গানে বিপুল পরিমানে বাংলা শব্দের ব্যবহার করে ভাওয়াইয়া গানকে উত্তরবঙ্গের গন্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্ঠা করেছেন। এই ভাওয়াইয়া গানে বাংলা শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য—

> "যেকোনো ভাষায় অন্য ভাষার আগমন রোধ করা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহন করে আপন করে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন সংস্কৃত, আরবী, উর্দু প্রভৃতি ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে আজকের হিন্দি ভাষা। কেউ বলতে পারবে যে হিন্দি ভাষায় অন্য ভাষার বিভিন্ন শব্দ সরাসরি আসেনি? একই ভাবে বাংলা ভাষাতেও অনেক সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শব্দ সরাসরি এসেছে। কাজেই সময়ের সাথে সাথে রাজবংশী ভাষাতেও অন্য ভাষার বিভিন্ন শব্দের আগমন ঘটবে তা কখনো আটকে রাখা যাবে না। তার প্রভাত সঙ্গীতেও পড়তে বাধ্য।"[৩]

এর জন্য সমালোচকদের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে। কিন্ত তবুও তিনি থেমে যাননি। প্রত্যন্ত একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করলেও শিল্পী তাঁর আপন প্রতিভায় অর্জন করেছিলেন এক বর্ণিল ব্যাক্তিত্ব। ১৯৬৪ সালে প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ডের পর ২০১৪ সালে কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী বিশেষ করে জগদীশ আসোয়ার, ড: জয়ন্ত কুমার রায় এবং যোগেশ চন্দ্র বর্মন এর সহযোগিতায় নিজের রচিত এবং কিছু প্রচলিত গান নিয়ে ২০টি গানের একটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে পরিচালক তপন রায়ের পরিচালনায় সেই সমস্ত গানের দৃশ্য-সংবলিত ভিডিও প্রকাশিত হয় যা বিভিন্ন ইউ টিউব চ্যানেলে উপলব্ধ। উত্তরবঙ্গের মানুষ এর সংস্কৃতি রক্ষায় ও উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা কাজ করে গেছেন। এরকম একজন মানুষের জীবন ও তাঁর রচনা প্রতিটি মানুষের জানা প্রয়োজন। সংস্কৃতি জগতের এই মহান মানুষটির জীবন এবং তাঁর রচিত ২টি বিখ্যাত গান সম্মন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

জন্ম –

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের অনন্য জাদুকর ধনেশ্বর রায় এর জন্ম ২৮ সে অক্টোবর ১৯৩৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত হেদায়েত নগর গ্রামে এবং মৃত্যু ২২শে মে ২০২২। ধনেশ্বরের রায়-এর পিতার নাম আনন্দমোহন রায় এবং মাতা পুণ্যেশ্বরী বায়। আনন্দমোহনের রায়-এর দুই ছেলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এবং ধনেশ্বর রায়। পিতার পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বাবা হেদায়েত নগর গ্রামের বেদেং ধনীর (জমিদার) বাড়িতে

সরকারের কাজ করতেন। পরবর্তিতে জটেশ্বরের কাছে আলিনগরে বসতি স্থাপন করেন। মাএ ৪ বছর বয়সে ধনেশ্বর রায় এর মাতৃবিয়োগ হয়। মা হারা ধনেশ্বর রায় বাবার স্নেহ ও মমতায় বড় হন। আনন্দমোহন রায় খুব ভালো কীর্তন গাইতে পারতেন। ধনেশ্বর রায় তাঁর গানের চর্চায় পিতার কাছ থেকে অনেকটা প্রেরণা পেয়েছিলেন। তবে খুব বেশীদিন তাঁর বাবাকেও পাননি। ধনেশ্বরের বয়স যখন মাত্র ২১ বছর তখন তার বাবা পরলোক গমন করেন। ধনেশ্বর রায়-এর জননী পুণ্যেশ্বরী রায় বর্তমানে বাংলাদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত নীলফামারী মহকুমার চাপানী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর মা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

> "মা আমার সঙ্গীতের প্রথম গুরু। খুব সুন্দর সুরে মা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তেন। আর এই সুর শুনে শুনেই সুরের সাথে আমার প্রথম পরিচয়।"[৪]

কিশোর ধনেশ্বর রায় এর ছিল এক অসাধারণ প্রতিভা। একবার শুনেই যেকোন গান তিনি নিজে গাইতে পারতেন। একবার তিনি তার বাবার সাথে মামার বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানে কোনো এক ভাওয়াইয়া সঙ্গীতশিল্পী দোতারা বাজিয়ে ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করছিলেন এবং কিশোর ধনেশ্বর রায় সেই গান মনোযোগ সহকারে শোনেন। পরের দিন সেই গান হুবহু গেয়ে শোনান কিশোর ধনেশ্বর। কোনো গুরুর কাছে না শিখেই এবং কোনো রকম পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই নিজে নিজেই দোতারায় গানের সুর বাজিয়ে শোনান। বাড়ির বড়োরা এতে বিস্মিত হয়ে যান। আনন্দমোহন বাবু সেদিনই বুঝতে পেরেছিলেন পুত্র ধনেশ্বর রায়ের প্রতিভা।

শিক্ষা ও সঙ্গীত সাধনা –

ধনেশ্বর রায়-এর ছেলেবেলা কেটেছে হেদায়েত নগর গ্রামে। গ্রামটি ছিল সবুজ সতেজ ও প্রকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা কিশোর ধনেশ্বরের মনে এক গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করে। বাড়ীর পাশেই ধূ-ধূ মাঠ। পূর্ব দিকে বয়ে গেছে মুজনাই নদী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই প্রত্যন্ত অঞ্চলেই বেড়ে ওঠেন ধনেশ্বর রায়। অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় জগদীশ আসোয়ার 'দাগ' নামক একটি পত্রিকায় ধনেশ্বর রায় সম্পর্কে লিখেছেন-

> "বাড়ী-ঘর চার পাশের পরিমন্ডল দেখে বোঝার উপায় নেই যে এখানেই বসবাস করেন ধনেশ্বর রায়ের মতো একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। এটা অবশ্য প্রত্যাশিত, প্রত্যন্ত অঞ্চলেই থাকবেন একজন প্রকৃত লোকশিল্পী। মৃত্তিকা ঘনিষ্ট না হলে কেমন করে গাইবেন নির্ভেজাল মাটির গান? এর জন্য প্রয়োজন মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, সোঁদা মাটির গন্ধ এবং লোকজীবনের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা। অতি কৈশোর কাল থেকে ধনেশ্বর রায় এইসব অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির সবগুলিই পেয়েছেন বিশাল বিপুলতায়। হয়তো বা এই কারনেই তিনি হতে পেরেছেন একশোভাগ খাঁটি একজন অসামান্য লোকশিল্পী।"[৫]

ধনেশ্বর রায়ের শিক্ষা শুরু গ্রামেরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেনী পড়ার সময় বিদ্যালয়েরই শিক্ষক সুধীর চন্দ্র দের কাছে গান শেখা শুরু করেন। শুরুতেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। শনিবার অর্ধদিবস স্কুল করার পর সুধীর চন্দ্র দের বাড়িতে গিয়ে তিনি গান শিখতেন। গান শেখা ছাড়াও ধনেশ্বর স্কুলের বিভিন্ন নাটকেও অংশগ্রহন করতেন এবং তাঁর অভিনয় ক্ষমতাও ছিল বেশ প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরেও তিনি প্রায় ৫ বছর গানের তালিম নিয়েছেন। এর পর সুধীর চন্দ্র লাহিড়ী-এর কাছে ৫ বছর রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুলগীতির তালিম নেন। পাশপাশি নরেন রায় এর কাছে শেখেন ভাওয়াইয়া গান। নরেন রায়ের কাছে দীর্ঘ দিন ভাওয়াইয়া গান শেখেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি শিখলেও তিনি মনে প্রাণে ভাওয়াইয়া গান

কে ভালোবাসতেন। সবশেষে তাই তিনি ভাওয়াইয়া গানকেই বেছে নিয়েছেন তাঁর জীবনে। পরিবারে আর্থিক অনটন, অসুবিধার কারনে পড়াশোনা আর বেশী দিন করা সম্ভব হয়নি। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করে সেখানেই ইতি টানেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। ছাত্র হিসাবে বেশ মেধাবী ছিলেন ধনেশ্বর। প্রতিবার পরীক্ষায় প্রথম হতেন। শিক্ষকদের কাছ থেকেও পেতেন বেশ প্রশংসা। অর্থ যেখানে সমস্ত কিছুর মানদন্ড সেই আর্থিক অনটনের কারনেই অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যবনিকা টানতে হয় ধনেশ্বর রায় কে।

কর্ম ও সংসার জীবন –

পড়াশুনা ছেড়ে বাবার সঙ্গে কৃষিকাজে মনোযোগ দেন ধনেশ্বর রায়। কিন্তু সে কাজ তাঁর ভালো লাগলো না। তাই অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যাবসা শুরু করলেন। সঙ্গে গান বাজনা ও যাত্রা দলে কাজ করা। কিন্ত সেই ব্যবসাতেও তেমন ভালো ফলাফল করতে পারলেন না। শুরু করলেন দলিল লেখার কাজ। কিন্ত সেখানে অনেক সময় মিথ্যে কথা বলতে হয়। মিথ্যে কথা তাঁর পছন্দ নয়| সেই কারণে দলিল লেখার কাজও ছেড়ে দিলেন। পরিবারে তখন তীব্র আর্থিক অনটন। এই রকম পরিস্থিতিতে ধনেশ্বর রায়কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। এই বিয়ে প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়। বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়-এর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয় আলিনগরের অন্তরাম রায় এর কন্যা নিদয়া রায়ের সাথে। অপরদিকে আনন্দমোহন রায় যেখানে সরকারের কাজ করতেন, সেই জমিদার (বেদং ধনি) তাঁর কন্যার সাথে জ্ঞানেন্দ্র নাথ-এর বিয়ে দেবেন বলে প্রস্তাব পাঠান। বিয়ের সম্বন্ধ ততদিনে ঠিক হয়ে গেছে। বাধ সাধেন বেদং ধনি। পারিপার্শ্বিক চাপের ফলে সেই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন পিতা আনন্দমোহন রায়। বিয়ে ভেঙ্গে গেলে অন্তরাম রায় তাদের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এদিকে আনন্দমোহন বাবুর সেই ক্ষতিপূরন দেওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিলনা। তাই কন্যা পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, ছোটো ছেলে ধনেশ্বর রায়-এর সঙ্গে তাদের কন্যার বিয়ে দিলে তারা জরিমানা নেবেন না। আনন্দমোহন রায় সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং বাবার কথামতো ছোট ছেলে ধনেশ্বর রায়ও বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। অবশেষে আলিনগর নিবাসী অন্তরাম রায়ের কন্যা নিদয়া রায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ধনেশ্বর রায়।

অনেকে বলে থাকেন যে ভাওয়াইয়া গান 'বাউদিয়া' (ভবঘুরে) দের গান। হয়তো বা তাই। তিনি কৃষিকাজ, ব্যবসা, কোনোটিতেই সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। শেষে পাকাপাকি ভাবে গানের শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে আমৃত্যু সঙ্গীত শিক্ষকতা করে যান। দীর্ঘদিনের সঙ্গীত শিক্ষকতার জীবনে তৈরি করে গেছেন বহু ছাত্র-ছাত্রী। তাদের মধ্যে অনেকে আজ সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সম্মান ও স্বীকৃতি –

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত জগতে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলার মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান ও ভালাবাসা পেয়েছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারী সম্মান-স্বীকৃতি ও পুরস্কার। ১৯৯৭ সালে কোলকাতায় আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি তাঁকে আব্বাসউদ্দিন স্মারক সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৯৯ সালে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে তাঁকে সম্মান প্রদান করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তার অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করেন ২০১০ সালে। ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে পঞ্চানন বর্মা পুরস্কারে ভূষিত করেন। ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'পঞ্চানন' সম্মানে ভূষিত হন। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অবদানের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ধনেশ্বর রায় কে সংবর্ধনা দেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রসার ভারতী সম্মিলিত ভাবে ধনেশ্বর রায় কে সংবর্ধনা দেন। ২০১৫ সালের ৮ মে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অ্যাকাডেমী' পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার 'বঙ্গরত্ন' সম্মান প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করেন। এছাড়াও ভারত সরকারের বার্ধ্যক্য শিল্পী ভাতা পেতেন।

ধনেশ্বর রায় রচিত দুটি গানের সাহিত্যিক বিশ্লেষণ –

ধনেশ্বর রায় রচিত আনুমানিক ১০০০ গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান, ও বৈদেশ্যা বন্ধুরে, মোর সোনা বন্ধুরে, একবার উত্তর বাংলায় আসিয়া যান হামার জাগাটা দেখিয়া যান।

ও বৈদেশ্যা বন্ধুরে, মোর সোনা বন্ধুরে,
একবার উত্তর বাংলায় আসিয়া যান হামার জাগাটা দেখিয়া যান
মনের কথা শুনিয়া যান রে
তোমার কথাও কয়া যান রে।।
জলপাইগুড়ির বাড়ই পান, কোচবিহারের হেউতি ধান
দার্জিলিং এর চা বাগান, জলদা পাড়ার জঙ্গল খান
ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া যান রে।।
তিস্তা তোর্ষা মানসাইর ধারে, সংকোশ রায়ডাক মুজনাইর পাড়ে
ঢুলিয়া পরে কাশিয়ার বন, মাহুত বন্ধু করে গান
আরো আছে মৈষের বাথান রে।।
দোলার জল থৈ থৈ, আছে শিঙ্গি মাগুর কই
শিলিগুড়ির গাইয়া দই, জটেশ্বরের চিড়া খৈ
দিনাজপুরের লিচু জাম, মালদহের ফজলি আম
মনের সুখে খায়া যান রে।।
কোচবিহারের রাসের মেলা, জলপাইগুড়ির জল্পেশ মেলা
ঐটে আছে নাগরদোলা, আরো আছে সার্কাস খেলা
আছে আরো ভাওয়াইয়া গান রে।।

গানটিতে একদিকে যেমন উত্তরবঙ্গের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তেমনি অপরদিকে 'একবার উত্তর বাংলায় আসিয়া যান হামার জাগাটা দেখিয়া যান, মনের কথা শুনিয়া যান রে' এই কথার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের মানুষের সরলতা এবং অতিথি পরায়নতা অত্যন্ত সাবলীল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই গান সম্পর্কে ধনেশ্বর রায় এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, গঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। নদী নালা জঙ্গলে ঘেরা উত্তরবঙ্গের সহজ সরল সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও ঢুকে পড়তে থাকে শহর কলকাতার সংস্কৃতি। ঠিক একই সময়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের মানুষের সাথে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের একটা বড় বিভেদ পরিলক্ষিত হতে থাকে। এই বিভেদে শিল্পীর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। রচনা করলেন কালজয়ী সেই গান। এই গানের মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীকে উত্তরবঙ্গের এই নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সাথে সাথে সমস্ত বিভেদ ভুলে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষকে আপন করে নেবার জন্যে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। গানের প্রতিটি ছত্রে উত্তরের নৈস্বর্গিক সৌন্দর্য্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত রকম বিভেদ ভুলে মৈত্রীর ডাক দিয়েছেন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কে।

ধনেশ্বর রায় এর অন্য একটি বিখ্যাত গান –

ওকি ও মোর গাড়িয়াল ফিরিয়ারে আইসো
গাড়ি ধরিয়া গেইলের গড়িয়াল
চিলমারীর বন্দরে
পন্থের দিকে আছং রে চায়া
ফিরিয়া আইসো ঘরে রে
গাড়িয়াল ফিরিয়ারে আইসো।।

কিবা কইছং কিবারে নাই কং
তাতে হইছেন গোঁসা
ভাঙ্গিলেন মোর সোনার সংসার
ভাঙ্গিল সুখের বাসা রে
গাড়িয়াল ফিরিয়া আইসো।।
জন্মের মতে গেইলেন রে গাড়িয়াল
উত্তরবাংলা ছাড়ি
তোমার বাদে এলাও রে কান্দং
অভাগিনী নারী রে গাড়িয়াল
গাড়িয়াল ফিরিয়ারে আইসো।

উত্তরবঙ্গ এক সময় ছিল শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলে ঘেরা বনাঞ্চল। আজ বিশ্বায়নের যুগে উত্তরবঙ্গের গ্রামেও পরেছে শহুরে সংস্কৃতির ছাপ। যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। আগের সেই জঙ্গল আর নেই। নেই সেই বাঘ, হাতি, ভাল্লুকের অবাধ আনাগোনা। এক সময় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বানিজ্যিক শহরের সাথে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার চিলমারী বন্দর সহ অন্যান্য বাণিজ্য শহরের ব্যাবসা বাণিজ্য সম্পাদিত হত। আর এই ব্যবসায়ীক আদান-প্রদানের মূল মাধ্যম ছিল হাতির পিঠে, গরু বা মোষের গাড়িতে করে। মোষের গাড়ির ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দে ঘুম ভাঙত অনেকেরই। উদাস করা কণ্ঠে শোনা যেত গাড়িয়াল (মোষের গাড়ির চালক) এর গান মাহুত বন্ধুর গান। সময়ের সাথে সাথে বদলে গেছে অনেক কিছু। মোষের গাড়ির জায়গায় এসেছে মোটর চালিত গাড়ি যানবাহন। তাই আর সেসব গোরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। দেখতে পাওয়া যায়না সেইসব গাড়িয়াল বন্ধু, মাহুত বন্ধু ও মইশাল বন্ধু দের। ব্যাধিত ধনেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গীতে সেই যন্ত্রনা প্রকাশ করলেন এক অন্য ভঙ্গিতে। শিল্পী মন ফিরে পেতে চাইছেন তার ফেলে আসা সেই পুরনো দিন গুলি। পুনরায় গাড়িয়াল বন্ধু, মাহুত বন্ধু ও মইশাল বন্ধুদের ফিরে আসবার জন্য আবেদন করছেন তাঁর রচিত গানের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র :

১. পাল, হরিশচন্দ্র, (সম্পা.), উত্তর বাংলার পল্লীগীতি, চটকা খন্ড, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, ১-১ এ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২, পৃ. শিল্পী পরিচিতিতে উল্লেখিত
২. বিশ্বাস, রতন, (সম্পা.), বাংলার ভাওয়াইয়া, বলাকা, ৮ সি টেমার লেন, কোলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ৩৭২
৩. রায়, ধনেশ্বর, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জুন, ১০, ২০১৯
৪. রায়, ধনেশ্বর, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জুন, ২৩, ২০১৯
৫. আসোয়ার, জগদীশ, ধনেশ্বর রায়:অকৃত্রিম জীবনের বিশুদ্ধ দুদ্ধধবলতা, দাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০১২ পৃ. ৯৮